খোপে আটকাতে না-চাওয়া মানুষরা

শাশ্বতী ঘোষ

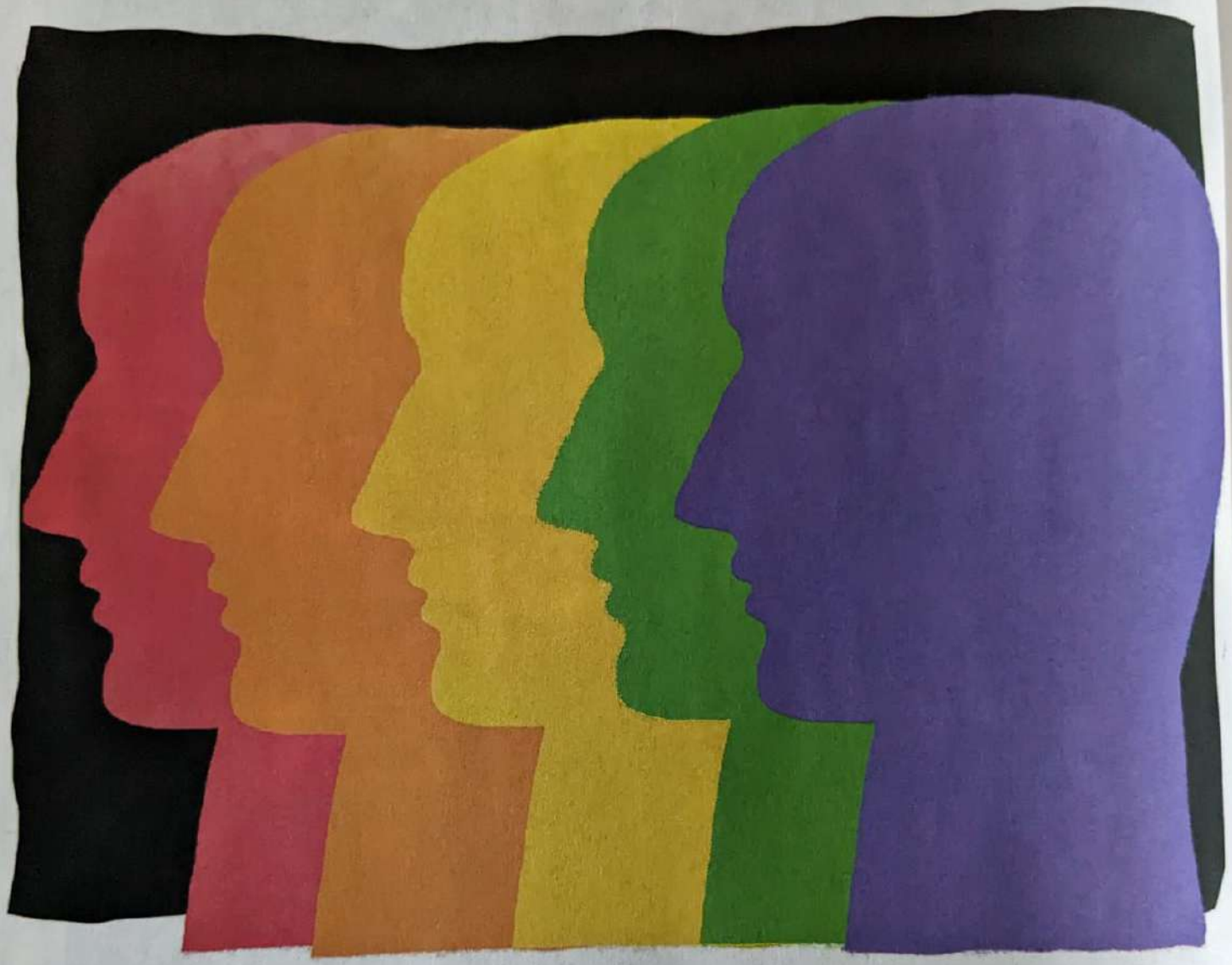

আইনে বদল আসতে শুরু করেছে অনেক পরে, কিন্তু মনগুলো হয়তো বদলাতে শুরু করেছিল আগেই। মোটামুটি তিন দশক হল ভিন্ন যৌন পরিচয় আর শরীরী পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার, সমাজের চোখ রাঙানির বিরুদ্ধে চুপিচুপি চোরদায়ে ধরা পড়া নয়, কণ্ঠস্বরকে জোর করে প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণ ছুড়ে দেওয়া শুরুর বয়স। কলকাতার ভিন্ন যৌন পছন্দের স্বীকৃতির আন্দোলনের অন্যতম মুখ পবন ঢাল লিখছেন যে, ১৯৯৯ সালের জুলাই ২ তারিখে তাঁরা নিউ ইয়র্কের স্টোনওয়াল সংঘর্ষ আর গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহকে মনে রেখে কলকাতায় মাত্র পনেরোজন বন্ধু নিয়ে ফ্রেন্ডশিপ ওয়াকে যোগ দিয়েছিলেন, সেটাই ছিল ভিন্ন যৌনতার স্বীকৃতির দাবিতে প্রথম কোনও দক্ষিণ এশীয় শহরে পথ হাঁটা। সেই অহঙ্কৃত পদযাত্রা এখন সারা ভারতে ২৫-৩০টি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। নিউ ইয়র্কের পুলিশ ভিন্ন যৌনতার নারী ও পুরুষদের আড্ডা স্টোনওয়াল ইন-এ তল্লাশি নিতে গেলে উপস্থিত মানুষজন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন, পরে তা ছড়ায় আরও অন্যত্র। আমাদের দেশের পুলিশ এখনও ভিন্ন যৌনতার মানুষজনদের, বিশেষত পুরুষদের হেনস্থা করে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা, যা পায়ুকামকে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' বলে বেআইনি ঘোষণা করেছিল সেই ইংরেজ আমলের আইনেই, তাকেই হাতিয়ার করে, যদিও এখন তা আর অপরাধ বলে গণ্য নয়। কিন্তু ১৯৬৯ সালে খোদ ইংল্যান্ডে সমকামিতা আইনি হলেও স্বাধীন ভারতে তা আইনি হতে আরও বহু বছর লাগবে। যদিও পবন নব্বইয়ের দশক থেকেই কাউন্সেল ক্লাব তৈরি করে ভিন্ন যৌনতার মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর বিভিন্ন প্রয়াস নিয়েছিলেন। সেই সময়েই সমপ্রেমী মেয়েদের পাশে থাকতে তৈরি হচ্ছে স্যাফো। স্যাফোকে নারী সংগঠনদের জোটে অন্তর্ভুক্ত করাটাও একসময়ে বেশ কিছু আলোচনার পরেই সম্ভব হয়েছিল, মধ্যবিত্ত নারীবাদীদের ভাবনা থেকেও এই অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। আবীর-সাগরিকা, মালবিকা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অনেক শাশ্বতী-বৈতালীরও আত্ম-অনুসন্ধানের যাত্রা ছিল সেটা।

চলচ্চিত্র থেকে মূল ধারায়

বাঙালি সমাজে হয়তো ভিন্ন যৌনতার প্রশ্নটা ফিসফিস থেকে বসার ঘরে বা চায়ের টেবিলে এসেছে অকালপ্রয়াত চিত্রপরিচালক, লেখক ঋতুপর্ণ ঘোষের (১৯৬৩-২০১৩) সুবাদে। আর গোপনতা কাটিয়ে ভিন্ন যৌন পছন্দের বিষয়টা, তাঁদের হাবভাব ইত্যাদি বিশেষত, ঋতুপর্ণকে নিয়ে নানাজনের ফাজলামিরও একটা বড় ভূমিকা ছিল। তা হয়তো বিষয়টাকে লঘু করেছে, মানুষগুলিকে ছোট করেছে, কিন্তু প্রকাশ্যে ইয়ার্কিও তো এক ধরনের আলোচনার পরিসর তৈরি করে। ঋতুপর্ণ ঘোষের চলচ্চিত্র *মেমরিজ ইন মার্চ* (২০১০), *চিত্রাঙ্গদা* (২০১২)— দু'টিই ভিন্ন যৌনতার প্রশ্ন, বা নারীপুরুষের চিরন্তন খোপে সব সম্পর্ককে ঢুকিয়ে দিতে চাওয়া নিয়ে মানুষের অস্বস্তিকে সামনে এনেছে। আর নিজের শরীরকে নিয়ে অস্বস্তি, নিজেকে নারী ভেবে নারী শরীর পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় একের পর এক অস্ত্রোপচার করে তার ধকল সামলাতে না-পেরে অকালে ঋতুপর্ণের চলে যাওয়া এই গোষ্ঠীর মানুষজনের সমস্যা নিয়ে আমাদের সামনে হঠাৎ একটা দরজা খুলে দিয়েছে। তাই হয়তো কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের *আরেকটি প্রেমের গল্প* (২০১০), যেখানে অন্যতম ভূমিকায় ছিলেন ঋতুপর্ণ, সেই নারী-হতে-চাওয়া পুরুষদের প্রান্তিকতা, সে ঋতুপর্ণ হন বা চপল ভাদুড়ি, তাঁদের সঙ্গীদের হাতে বৈষম্য আর নির্যাতনের শিকার হয়ে চলা, এই সব নিয়ে অন্তত মধ্যবিত্তরা ভাবনাকে নিজেদের জীবনে, মননে আস্তে আস্তে ঠাঁই করে দিয়েছেন। তাই বিবাহ সমতা, অর্থাৎ নারী বা পুরুষের বিবাহ নয়, দু'জন মানুষের বিবাহের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে যে-৬২জন মা-বাবা সন্তানদের জন্যে স্বাক্ষর করছেন, তার মধ্যে কয়েকজন বাঙালিও আছেন।

ঋতুপর্ণ ঘোষের জন্য কিনা জানি না, আরও একাধিক চলচ্চিত্রে ভিন্ন যৌনতার ভাবনাকে মজার বিষয় না-করে বেশ সংবেদনশীলতার সঙ্গেই দেখা হয়েছে। *উষ্ণতার জন্য* (২০০৩), *নীল নির্জনে* (২০০৩), *সম—দ্য ইকুয়ালস* (২০১০), *কয়েকটি মেয়ের গল্প* (২০১২), এই ছবিগুলি এসেছে। বিশেষভাবে লিখতে হয় *অচেনা বন্ধুত্ব* (২০১৫) ছবিটির কথা যেখানে রূপান্তরিত আবৃত্তিকার, নাট্যকর্মী তিস্তা দাস নিজের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কী করে তিনি স্বীকৃতির জন্য লড়াই চালাচ্ছেন, তার কথকতা এই চলচ্চিত্র। এখানে তিস্তার কথা আলাদাভাবে লেখা প্রয়োজন। তিস্তার যাত্রাই হয়তো বাঙালি সমাজে 'তৃতীয় লিঙ্গ' বা ভিন্ন যৌনতার মানুষদের নিয়ে পরিবর্তনের কিছুটা দিক নির্দেশ করবে। তিস্তা নিজেকে মেয়ে বলেই মনে করতেন। মধ্য কলকাতার একটি নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা সাম্মানিক নিয়ে ভর্তি হয়েও শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি, এত ব্যঙ্গ আর বিরোধিতার সামনে পড়তে হয়েছিল। পরে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করতে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। 'হিজড়া' নয়, শুধু তালি বাজানো নয়, তারাও যে মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে, সেটা প্রতিষ্ঠার লড়াই। তাই যখন সুপ্রিম কোর্ট 'তৃতীয় লিঙ্গ'-র স্বীকৃতি দিল, মনে পড়ে তিস্তার আক্ষেপ, 'আমি তো নারীর পরিচয়ে বাঁচতে চাই, তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয়ে নয়'। আবার *নগরকীর্তন* (২০১৭), একজন যে নিজেকে মেয়ে ভাবে, পরিবার তাকে ঠাঁই না দিলে কীভাবে তাকে প্রান্তিক হয়ে কতরকম ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে বাঁচতে হয়, তার এক সংবেদনশীল পরিক্রমা।

তবে এই সব বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের থেকে অনেক বেশি নাড়া দিয়েছিল ২০০৫ সালে দেখা *পিকু ভালো আছে*—পিকুর সমপ্রেমী পুরুষ হিসাবে নিজেকে আবিষ্কারের যাত্রা, যখন জানলাম পিকু বা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ডাক্তার তীর্থঙ্কর গুহ ঠাকুরতার নিজের গল্প এটা এবং পিকুর দিদি আর মায়ের চরিত্রে তার নিজের দিদি এবং মা-ই অভিনয় করেছেন। শুধুমাত্র বন্ধু এবং পরিবারের লোকদের নিয়ে হাতে ধরা ভিডিয়ো ক্যামেরায় এক মাসে এই ছবিটা তোলা, তখনই মনে হয়েছিল, কিছু কিছু পরিবার সদস্যদের ভিন্ন যৌনতাকে মেনে নিতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ বাঙালি সমাজে শুধুমাত্র কৌতুক আর কৌতূহলের বিষয় থেকে মূল ধারার আলোচনায় ভিন্ন যৌনতার মানুষজন আসছেন। শুধু চলচ্চিত্রে নয়, সমাজে রাজনীতিতেও। তাই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ভিন্ন যৌনতার মানুষদের নিয়ে লেখা উপন্যাস *হলদে গোলাপ* ২০১৫ সালে আনন্দ পুরস্কার পেলে সেই গ্রহণযোগ্যতার পরিসর প্রসারিত হচ্ছে বলেই মনে হয়।

শব্দ নিয়ে দু'এক কথা

তৃতীয় লিঙ্গ বলতে যাঁরাই ভিন্ন যৌনতার কথা বলেন, তাঁদের সবার কথাই একত্রে ওই তৃতীয় লিঙ্গের শব্দবন্ধে ধরা হয়। তাই এই ধরনের সব মানুষ, যাঁরাই নারীপুরুষের দ্বৈত-র বাইরে শরীর নিয়ে, সম্পর্ক নিয়ে অন্যভাবে ভাবেন, তাঁদের সবাইকেই ভিন্ন যৌনতার মানুষ অভিধা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যাঁরা সমলিঙ্গের মানুষকে সঙ্গী হিসেবে পছন্দ করেন, তাঁরা আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের শরীরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাতে চান, অনেকেই চান না, যাঁরা এই শরীরী বদলের প্রক্রিয়ার নানা স্তরে রয়েছেন। যাঁর শরীরে নারী ও পুরুষ দু'জনের শরীরী চিহ্নই বর্তমান কিন্তু শৈশবে ভুল ভাবে লিঙ্গ চিহ্নিত হয়েছেন যাঁদের আসলে নির্দিষ্ট খোপে ফেলা যায় না, বয়ঃসন্ধিতে এসে বদল বুঝতে পারছেন এরকম মানুষজনও আছেন, তাঁরা ইন্টারসেক্স মানুষ। আবার যাঁরা সঙ্গী হিসাবে নারীপুরুষ দু'জনকেই পছন্দ করেন থেকে শুরু করে যাঁরা নিজের লিঙ্গকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে চান না, সমাজ নির্ধারিত নারী বা পুরুষের খোপে পড়তে চান না এরকম সমস্ত মানুষজনই রয়েছেন। মনে পড়ছে বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান কাহিনির লেখিকা উরসুলা কে ল্য গুইন-এর কাহিনি *দ্য লেফট হ্যান্ড অফ ডার্কনেস*-এর কথা। পৃথিবী থেকে একজন মানুষ, এক পুরুষ এক অন্য গ্রহে গিয়ে পড়েছে, যেখানে নারী বা পুরুষ বলে লোকরা চিহ্নিত নয়। এই নবাগত পুরুষের সহায়ক ব্যক্তিটি পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনও নারী কখনও পুরুষের ভূমিকা নিচ্ছে, সে বেচারি মানুষটি সেটা সামাল দিতে গিয়ে পড়ছে বিষম বিপদে। এখন কল্পবিজ্ঞানের স্তর পেরিয়ে অনেক মানুষ এবং মানুষীই আর নারী বা পুরুষের নির্দিষ্ট খোপে, সমাজ নির্ধারিত আচরণে নিজেদের বা কাছের মানুষদের ফেলতে চাইছেন না, তা নিয়েও আন্দোলন গড়ে উঠছে। তাই তিস্তার মতো মানুষীদের কথা আরওই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, যাঁরা রূপান্তরের পর রূপান্তরিত বা তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয় নিয়ে নয়, এক মানুষী হিসেবেই পরিচিত হতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সকলের কাছে ক্ষমা চেয়েই এই নিবন্ধে ভিন্ন যৌনতা বা যৌনাকাঙ্ক্ষার সমস্ত মানুষকেই ভিন্ন যৌনতার শব্দবন্ধে ধরা হচ্ছে। তৃতীয় লিঙ্গ হয়তো সেখানে এই ধরনের মানুষদের পরিসরটাকে ছোট করে দেয়। তবে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা বলতে অনেকেই বোঝেন শুধুমাত্র তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে, তবে তাঁদের সত্তার মতোই এই শব্দটাও বদলায়।

> কিছু কিছু পরিবার সদস্যদের ভিন্ন যৌনতাকে মেনে নিতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ বাঙালি সমাজে শুধুমাত্র কৌতুক আর কৌতূহলের বিষয় থেকে মূল ধারার আলোচনায় ভিন্ন যৌনতার মানুষরা আসছেন। চলচ্চিত্রে, সমাজে, রাজনীতিতেও।

◆◆◆◆◆◆◆◆

মূল ধারায় ভিন্ন যৌনতা

ভোটার কার্ড রয়েছে। তবু ভিন্ন যৌনতার মানুষজনের কথা রাজনীতির মানুষের মনে পড়ে নির্বাচন এলে। ২০২১ সালের তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহারে এঁদের সমস্যার কথা উঠে এসেছিল। তৎকালীন নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার কাছে যখন জানতে চাওয়া হয় পুরসভা কি ওদের পরিচয়পত্র দিতে পারে, তাতে তিনি খোঁজ নেবেন বলেন। কিন্তু এই রাজ্যে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজনকে যথাযথ পরিচয়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়াটা অসম্ভব

শ্লথ, তাই সরকারের সদিচ্ছা নিয়েই মানবাধিকার কর্মীদের প্রশ্ন। যেমন মানবাধিকার আইনজীবী দেবজ্যোতি ঘোষ প্রশ্ন করেছেন, আমাদের রাজ্যে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজনদের আশ্রয় আর দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া গরিমা গৃহের সংখ্যা এত কম কেন? সামাজিক বিচার আর ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে ১৮-৬০ বছর বয়সি ভিন্ন যৌনতার মানুষজন, যাঁরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, তাঁদের থাকার জন্য এই গরিমা গৃহের পরিকল্পনা। এখন প্রায় সব মূলধারার রাজনৈতিক দলই তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি, কাজ, দক্ষতার প্রশিক্ষণ এসবের প্রতিশ্রুতি দেয়। কোনও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ তাঁর লিঙ্গ পরিচয় বা যৌন পছন্দের কারণে যখন হেনস্থার শিকার হন বাস্তবে কতজন পাশে থাকেন? এখনও হেনস্থাকারীরাই সংখ্যাগুরু। প্রায় সব ভিন্ন যৌনতার মানুষজন নিয়ে কাজ করেন এমন কর্মীরাই জানিয়েছেন ৩৭৭ ধারা বিলোপ বা পায়ুকাম অপরাধ মুক্তকরণের পরেও এই ধরনের মানুষরা এখনও নিয়মিত পুলিশি হেনস্থার শিকার হন। পুলিশ ভয় দেখিয়ে শরীরী সুখ বা অর্থ দাবি করে, সুপ্রিম কোর্টের সুরক্ষার নির্দেশের পরেও। ডান-বাম-অতিবাম সমস্ত রাজনৈতিক দলই এখন ভিন্ন যৌনতার মানুষের পাশে থাকার কথা বলছে, ইস্তেহারে লিখছে। কিন্তু বাস্তবে কোনও নারী বা পুরুষ, যৌন পছন্দের কারণে বা 'অন্য'রকম হওয়ার জন্য আক্রান্ত হলে ভিন্ন যৌন পরিচয় বা ভিন্ন যৌনতার মানুষরাই পাশে থেকেছেন, আর হাতে গোনা কয়েকজন মানবাধিকার কর্মী ছাড়া অন্যদের বিশেষ পাশে পাননি। লেখা যাই থাকুক না কেন, এগিয়ে থাকা রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেও তৃতীয় লিঙ্গ বা ভিন্ন যৌনতার মানুষের প্রতি মনের ভিতরের বিরূপতা থেকেই যায়, যা বিভিন্ন ভাবে চেতনে অবচেতনে প্রকাশ পায়।

উচ্চবিত্তের 'শখ' নয়

ভিন্ন যৌনতার অভিব্যক্তিকে গোপন করার জন্য একসময় একে উচ্চবিত্তের 'বাই' বা বায়ুরোগ বলেও অভিধা দেওয়া হয়েছে। তবে যে আর্থিক বা সামাজিক স্তরেই মানুষটি থাকুক না কেন, পরিবারের মধ্যে কোনও পুরুষের 'মেয়েলি' আচরণ বা কোনও মেয়ের অন্য আর-এক মেয়ের প্রতি আসক্তি দেখলে সেই আচরণকে নিজের মতো করে থাকতে দেওয়ার বা বিকশিত হতে দেওয়ার মানসিক প্রসারতা এখন কতটা এসেছে জানি না। যে-কোনও ভিন্ন যৌনতার সহায়ক গোষ্ঠীর কাছে এখনও নিয়মিত আসে তাদের 'সিধে করার' নানা পথ অবলম্বন করা নিয়ে বহু অভিযোগ—সেখানে চলে নানা অত্যাচার, শরীরী নির্যাতন থেকে ধর্ষণ পর্যন্ত। এখনও। এখন হয়তো পাশের কেউ 'অন্যরকম' বলে একটু কৌতুক বা কৌতূহলের সঙ্গে সহ্য করা হবে, এই পর্যন্তই। নিজের বাড়ির মেয়েটি বা ছেলেটি 'এই রকম' হলে মানুষ এখনও কতটা মেনে নেয়, আদৌ মেনে নেয় কিনা জানি না। তবে জয়দীপ জানার সমলিঙ্গে পছন্দ নিয়ে বেড়ে ওঠা, নিজেকে জানাবোঝার লড়াই, বড় হয়ে ওঠা থেকে প্রকাশ্যে আসার যাত্রা নিয়ে আত্মজীবনী *আমার ভিতর বাহিরে* বইটিকে বার্তা ট্রাস্টের সংবাদে পরিচয় করাচ্ছেন 'জিয়া মাতা', যিনি নিজেকে পরিচয় দিচ্ছেন 'কুইয়ার' এবং 'জেন্ডার-ফ্লুইড' ষোলো বছরের সন্তানের মা হিসাবে। হয়তো সমাজ মাধ্যম এখন যেমন ঘৃণা প্রকাশের জায়গা করে দিয়েছে, তেমনই অপরিচয়ের গণ্ডিতে নিজেকে বেঁধে রেখেও প্রকাশ্যে আসার পরিসরও করে দিয়েছে। সমস্ত সমাজনিন্দিত আর বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর মতো ভিন্ন যৌনতার মানুষের আত্মপ্রকাশের পরিসর হয়ে উঠেছে এই সামাজিক মাধ্যম।

এটা বড়লোকি 'শখ' নয়, ভিন্ন যৌনতাকে পছন্দ করা মানুষ যে সমাজের যে-কোনও আর্থিক-সামাজিক স্তর থেকে আসতে পারেন, তার উদাহরণ যেমন সেই ২০১৮ সালে সুচন্দ্রা দাস আর শ্রী মুখার্জির বিয়ে। তারপর সারা দেশে এরকম নানা সমলিঙ্গের দম্পতির বিয়ের খবর সামনে এসেছে। চৈতন্য শর্মা আর অভিষেক রায়ের বিয়ে নিয়ে সারা ভারত তো বটেই, কলকাতাতেও তা খুব সরবে সংবাদমাধ্যমে এসেছিল। বিশেষত, সুপ্রিম কোর্টে সমলিঙ্গের বিয়ের আবেদনে সম্মতি না-মেলার পর যেন সুপ্রিম কোর্টকে বার্তা দিতেই এই ধরনের পর পর বিয়ের খবর এসেছে। মৌসুমি দত্ত আর মৌমিতা মজুমদার আহিরিটোলার ভূতনাথ মন্দিরে রীতিমতো সাতপাক ঘুরে, সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে সেরেছেন, সমাজমাধ্যমে বিয়ের খবর দিয়ে পরিবার, এলজিবিটিকিউআইএ গোষ্ঠী আর বাকি সমস্ত সমাজ আর সব ধরনের মানুষের সমর্থন আর সহযোগিতা চেয়েছেন এই বছর মে মাসে। আবার সমলিঙ্গে বিবাহের আবেদন সুপ্রিম কোর্ট নাকচ করার পরেই অনন্য আর উৎকর্ষ সুপ্রিম কোর্ট চত্বরেই আংটি বদল করে একে অন্যের সঙ্গে থাকার শপথ নিয়েছেন। হুগলির গেঞ্জি কারখানার কর্মী সাথী বাগ আর চকোলেট কারখানার কর্মী ঝুম্পা ঢালির পরিচয় ফেসবুকে, আলাপ গাঢ় হওয়ার পরে যখন বুঝলেন একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না, পরিবার মেনে নিল না, প্রচণ্ড মারধর। বাড়ি ছেড়ে ঘর বাঁধলেন দু'জনে। কিন্তু অনেকেই প্রকাশ্যে আসতে ভয় পান। কাজ চলে যাবে, মাথার উপরের ছাদ চলে যাবে। মেয়েরা তবু মনের আবেগ চেপে রাখতে পারেন, কারণ মেয়েদের সামাজিক শিক্ষা সেটাই। তবু যে-মেয়েরা আত্মবিশ্বাসী, এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি মেয়েকেই সঙ্গী হিসেবে পছন্দ করে, সমাজ সেই মেয়েকে নিয়ে সমস্যায় পড়ে। কিন্তু ছেলেদের মেয়েলি আচরণ সমাজ আর পরিবার আরওই মেনে নেয় না। কারণ পুরুষকে সবসময় হতে হবে পুরুষের মতো, তার 'মেয়েলি' হওয়াটা আরও বড় 'অপরাধ'।

আইনের পথ বেয়ে

হিজড়ারা মূলধারায় ছিলেন না, কিন্তু সমাজের মধ্যে তাঁদের একটা জায়গা ছিল, যেমন যোগিন বা অন্য নানা জনগোষ্ঠী, যাঁরা অন্য ধরনের যৌনতায় অভ্যস্ত, তাঁদেরও সমাজে এক ধরনের জায়গা ছিল, প্রান্তিকতাও নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সমাজের এক ধরনের মেনে নেওয়াও ছিল। ব্রিটিশরা এসে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে ১৮৭১ সালে ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্টের অধীনে এনে অপরাধী বানাল। ১৯৪৯ সালে এই আইন বাতিল হওয়ার পর তালিকার সমস্ত ব্রিটিশ শাসক চিহ্নিত 'অপরাধী' গোষ্ঠীও অপরাধ মুক্ত হল, তার সঙ্গে হিজড়ারাও। ১৯৯৪ সালে তাঁরা প্রথম ভোটের অধিকার পেলেন। ২০০৯ সালে যখন নাজ় ফাউন্ডেশন বনাম সুরেশ কৌশলের মামলা যা প্রথম বলল দু'জন প্রাপ্তবয়স্কের স্বেচ্ছায় যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়াকে অপরাধ বলে ধরা তাঁদের মানবাধিকার হরণ, বা ২০১৪ সালে আর-একটু এগিয়ে নালসা রায়ে সুপ্রিম কোর্ট যখন তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি দিল বা ২০১৮ সালে নভতেজ সিংহ জৌহরের মামলায় অবশেষে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারাকে বাতিল করল, যাতে দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ স্ব-ইচ্ছায় মিলিত হলে তা আর আদৌ অপরাধ বলে গণ্য হবে না, তখন মনে হল সমতার দিকে এক পা হলেও এগোনো গেল। ২০১৯ সালে এল তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সুরক্ষার আইন, ২০২০ সালে এল সেই সুরক্ষা কার্জকর করার বিধি। তবু তার বাস্তব ছবিটা কীরকম?

> সমলিঙ্গের দাম্পত্য ব্যাপারটাই যখন নতুন পদক্ষেপ, তখন তাঁরা বিবাহ নামক প্রাচীন ব্যবস্থায় ঢুকতে চাইছেন কেন? তবে কি এও এক ধরনের নারী-পুরুষের সম্পর্কই, যেখানে দু'জনের একজন পুরুষ ও একজন নারীর ভূমিকা পালন করে?

◆◆◆◆◆◆◆◆

সরকারি উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় সরকার গরিমা গৃহের উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্য ট্রান্সজেন্ডার বোর্ড তৈরি করেছে। ২০১৯ সালে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজনকে সুরক্ষা আইনের ৬ আর ৭ ধারায় বলা হয়েছে,

কেউ অস্ত্রোপচার করে লিঙ্গ পরিবর্তন করলে কোনও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনের ভিত্তিতে তাঁকে পুরুষ বা নারীতে পরিবর্তন করতে পারবেন। কিন্তু অস্ত্রোপচারের উপরে এত জোর কেন? তা যে কতটা অর্থ আর সময়সাপেক্ষ, তা কি আধিকারিকরা আর আইনপ্রণেতারা জানেন না? একটি দরিদ্র পরিবারে, যেমন, যে-পরিবারে পিঙ্কি প্রামাণিক বা দ্যুতি চাঁদ জন্মেছেন, সেই রকম পরিবারে যদি জন্মের সময় লিঙ্গচিহ্ন ভুল দেওয়া হয়, তা হলে তাঁরা বড় হয়ে কী করবেন? কোনও সংশোধনের পথ থাকবে না? শুধুমাত্র মেডিকেল বোর্ডের মতামতের ভরসায় থাকতে হবে?

তৃতীয় লিঙ্গের শংসাপত্র পেলে মিলবে সরকার নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক ২০২০ সালে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় পোর্টাল খুলেছে। অনলাইনে আইডেন্টিটি সার্টিফিকেট, রাজ্যওয়ারি গরিমা গৃহের তালিকা, প্রশিক্ষণ আর শিক্ষা সংক্রান্ত সব খবর পাওয়ার কথা। সেখানে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ হাজারের কিছু বেশি আবেদনের ভিত্তিতে চার হাজারের কিছু কম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫৩টি আবেদনের মধ্যে মাত্র একটি ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ২২২টি আবেদনের ১৭টি ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে। কিন্তু ২০১১ সালের জনগণনা বলেছে, ৪৯ লক্ষ মানুষ নারী পুরুষের বাইরে নিজেদের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তা হলে ২০২২ সালে অক্টোবর পর্যন্ত কেন মাত্র ১১,৫১৩টি আবেদন জমা পড়েছে? আমাদের দেশে যদিও ২৩টি স্বীকৃত ভাষা রয়েছে, ২০২১ সালে বলা হয়েছিল ইংরেজিসহ ১১টি ভারতীয় ভাষায় এই পোর্টাল কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। একে তো অনলাইনে, তায় নিজের ভাষায় না থাকায় হয়তো যাঁদের প্রয়োজন, তাঁরা কেউই এই পোর্টালে পৌঁছোতে পারছেন না।

দেবলীনা-অনুরাগ মৈত্রেয়ীর কথা

দেবলীনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লড়াকু ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০০০ সালে তিনি তারা বাংলা চ্যানেলের জন্য তৈরি করেছিলেন ভিন্ন যৌনতার মানুষদের নিয়ে একটি তথ্যচিত্র, 'সত্যের আড়ালে'। এটি তৈরি করতে গিয়ে পরিচয় হল সমপ্রেমী মেয়েদের সহায়ক সংগঠন স্যাফোর সঙ্গে, যার কথা আগেই লিখেছি। সেই সঙ্গে শুরু হল নিজেকে খোঁজার পালাও। সমপ্রেমী মেয়েদের উপর অত্যাচার আর বৈষম্যের ফলে তারাও অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়, তাঁদের নিয়ে বানালেন '... এবং বেওয়ারিশ'। আবার সেই অনুসন্ধান দিয়েছে তিন ভিন্ন যৌনতার মানুষ সঙ্গী খুঁজতে গেলে কী হতে পারে তাই নিয়ে ২০১৯ সালে 'গে ইন্ডিয়া ম্যাট্রিমনি'র মতো চলচ্চিত্র বানানো—ইয়ার্কির মধ্যে দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলার সাহস। ফিল্মস ডিভিশনের অর্থানুকূল্যে বানানো তথ্যচিত্রকে 'এ' সার্টিফিকেট দেওয়া হল, কোনও প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতার চিত্র নয়, শুধু কথাই যে শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য হতে পারে সেটা এক্ষেত্রে দেখা গেল!

অনুরাগ নিজেকে মেয়ে বলে ভাবেন, তাই মৈত্রেয়ী। আবৃত্তি করেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। বাণিজ্যিক একটি সংবাদমাধ্যম ২০১৮ সালে তাঁকে ডেকে নিল বাংলায় ভিন্ন যৌনতার মানুষদের নিয়ে প্রথম অনলাইন অনুষ্ঠান 'এলজিবিটি অনলাইন' সঞ্চালনার জন্য। ২০১৯ সাল পর্যন্ত তা চলেছিল। এখনও বিভিন্নভাবে মানুষদের, বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের ভিন্ন যৌনতার মানুষজনকে নিয়ে সচেতনতার পাঠ দিচ্ছেন, নানা মানবাধিকার আর রাজনৈতিক বিষয়েও মতামত দিচ্ছেন, পথ হাঁটছেন। নির্যাতনের শিকার তিনি নিজেও হয়েছেন, কিন্তু নির্যাতনের অলিম্পিক্স পেরিয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পগুলিই বলেন।

বিবাহ: দু'জন মানুষ না নারী ও পুরুষ

এখন ভিন্ন যৌনতার মানুষজনের অন্যতম আলোচনার বিষয় হল বিবাহে সমতা। বিয়ে মানে কি মুক্তি? নাকি এক নতুন শৃঙ্খল? নারীপুরুষের সম্পর্কের একধরনের স্বীকৃতি হল বিয়ে, যাকে রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, আইন সবাই মেনে নিয়েছে। আমাদের দেশে এখনও বিবাহ মানে শুধুমাত্র নারী ও পুরুষ, 'দু'জন মানুষ' নয়। তাই আদালতের কাছে অনেকগুলি আবেদন জমা পড়েছে বিয়ের সংজ্ঞার্থ 'নারী ও পুরুষ' বদল করে 'দু'জন মানুষ' করার জন্যে। শুধুমাত্র নারী ও পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন, এটা, আবেদনকারীদের মতে একধরনের বৈষম্য। দু'জন মানুষ একত্রে থাকতে গেলে পরস্পরের কাছে দায়বদ্ধ থেকে শুধু একসঙ্গে থাকলেই তো চলে। তা হলে একত্রে থাকতে গেলে কেন বিয়েই করতে হবে? হতে পারে যে সমাজ বিবাহিত যুগলকে যে-চোখে দেখে, সমলিঙ্গের যুগলকে সেই চোখে দেখে না। সমলিঙ্গের সম্পর্ককে একটু বেশি 'অবাস্তব', একটু 'অসম্পূর্ণ', একটু 'হীন' বলে মনে করা হয় বলেই কি স্বীকৃতি নিয়ে এই টালবাহানা?

'বিবাহিত' বলে স্বীকৃতি না পেলে কোনও যুগলকে নানা অসুবিধেয় পড়তে হয়। যেমন বিবাহিত না-হলে তাঁরা একত্রে সম্পত্তি কিনলে একে অপরকে উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করতে পারবেন না, পরস্পরের হাতে নির্যাতনের শিকার হলে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ আনতে পারবেন না, পরস্পরের কাছে ভরণপোষণের দাবি জানাতে পারবেন না, পরস্পরকে জীবনবিমার উত্তরাধিকারী বলে মনোনয়ন করতে পারবেন না— এরকম আরও অনেক অসুবিধা।

আবার হিন্দু বিবাহ আইনে সন্তান উৎপাদন দম্পতির জন্যে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে যদি স্বামী সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হন, তাহলে স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ বা বিবাহ নাকচের দাবি করতে পারেন। যদি দু'জন মানুষ বলতে সমলিঙ্গ যুগল হন, এবং তাঁরা হিন্দু হন, তাহলে এই ধারায় বিচ্ছেদের দাবি জানানো যাবে না।

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে বা প্রাচীন সাহিত্যে রূপান্তরিত নারী ও পুরুষের অনেক উদাহরণ রয়েছে এবং তাঁরা নিন্দিত নন বরং সম্মানিত। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর অর্ধনারীশ্বর রূপ নেন। আয়াপ্পা থেকে শুরু করে কেরলের কোট্টামকুলাঙ্গারা দেবী মন্দিরে পুরুষরা নারী সেজে পুজো দিতে যান, যে-ছবি ভাইরাল হয়। অন্য প্রধান ধর্মগুলি, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম বা ইহুদি ধর্মে এইরকম সম্পর্কের ন্যূনতম স্বীকৃতি নেই। তাই জনগণের দরবারে না গেলে এই নিয়ে কিছু বলতে সর্বোচ্চ আদালতও দ্বিধান্বিত। রাজ্যগুলিকে যে এ-বিষয়ে মতামত দিতে জানানো হয়েছিল, তাদের উত্তরেই স্পষ্ট বোঝা যায় কেন আদালত এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায়নি, এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ কেন লোকসভায় হওয়া উচিত বলে রায় দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে।

দম্পতি না যুগল

যদি আজ উত্তরাধিকার থেকে দত্তক, হিংসামুক্তি থেকে সন্তানমুক্ত জীবন, সবকিছুই আইন বদল করে দু'জন সহবাসী, এবং সহভাগী মানুষের জন্য এক করে দেওয়া হয়, তা হলে কি আবার সব সমলিঙ্গের যুগলরা দম্পতিই হতে চাইবেন? নাকি সর্বত্র সমান অধিকার আর বিচ্ছেদের তিক্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়ে যদি সহজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটা আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়, তা হলে হয়তো শুধু সমলিঙ্গের যুগলরা নয়, কিছু বিপরীত লিঙ্গের যুগলও দম্পতি নয়, যুগলের পরিচয়কেই কাম্য বলে মনে করবেন। 'বিয়ে'র ছাপ্পা কি এতই জরুরি? সমলিঙ্গের দাম্পত্য ব্যাপারটাই যখন নতুন পদক্ষেপ, তখন তাঁরা বিবাহ নামক প্রাচীন ব্যবস্থায় ঢুকতে চাইছেন কেন? তা হলে কি সমলিঙ্গের সম্পর্ক আসলে এক ধরনের প্রচলিত নারী-পুরুষের সম্পর্কই যেখানে দু'জনের একজন পুরুষ ও একজন নারীর ভূমিকা পালন করে। ফলে বিবাহের আর্তি চেপে রাখা যায় না?

এইসব প্রশ্ন আর প্রতিপ্রশ্ন নিয়ে বিতর্কেই আমাদের সমাজে ভিন্ন যৌনতার বা নিজেদের নারী বা পুরুষের খোপে আটকাতে না-চাওয়া মানুষদের সঙ্গে অন্য সব মানুষের, নারী ও পুরুষের গাঁটছড়া আরও দৃঢ় হবে বলেই স্বপ্ন দেখা। চলছে। চলবে।